প্রথম আলো মতামত

উন্নয়ন ও জাতীয় স্বার্থ

সুন্দরবন থেকে বঙ্গোপসাগর

আনু মুহাম্মদ | আপডেট: ০০:০৫, ফেব্রুয়ারি ২০, ২০১৪ | প্রিন্ট সংস্করণ

অন্য বহু দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অনেকগুলো বিশেষ শক্তির দিক আছে। উর্বর তিন ফসলি জমি, ভূগর্ভস্থ ও ভূউপরিস্থ বিশাল পানিসম্পদ, নদী-নালা, খাল-বিল, ঘন জনবসতি—সবই আমাদের সম্পদ, যা অনেকের নেই। এর বাইরেও আছে সুন্দরবনের মতো অসংখ্য প্রাণের সমষ্টি এক মহাপ্রাণ। অসাধারণ জীববৈচিত্র্য দিয়ে তা সারা দেশকে সমৃদ্ধ করে, যা লাখ লাখ মানুষের জীবিকার সংস্থান করে, আবার প্রতিটি প্রাকৃতিক দুর্যোগে লাখ লাখ মানুষকে বাঁচায়। আমাদের আরও আছে বঙ্গোপসাগর। স্থলভাগের তুলনায় দ্বিগুণের বেশি আয়তনের এই সমুদ্র জানা-অজানা বিশাল সম্পদের আধার। এই বিশাল সাগর শুধু সম্পদের দিক থেকে নয়, বিশ্ব-যোগাযোগ ও সার্বভৌম নিরাপত্তার দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। এই বিবেচনায় বাংলাদেশ শুধু নদীমাতৃক দেশ নয়, সমুদ্রমাতৃক দেশও। এর পরও আমাদের বাড়তি আছে গ্যাস, কয়লাসহ খনিজ সম্পদ। এত সব সম্পদ থাকা সত্ত্বেও কি একটি দেশকে গরিব বলা যায়? না। কোনো কারণ নেই গরিব থাকার। কিন্তু উন্নয়নের ধরনই এমন, শুধু যে মানুষ গরিব তা-ই নয়; আবাদি জমি, নদী, পানি, সমুদ্র, সুন্দরবন, গ্যাস ও কয়লা—সবই একের পর এক আক্রমণের শিকার, বিপন্ন। যা আমাদের সমৃদ্ধ জীবন নিশ্চিত করতে সক্ষম, সেগুলোই দেশি-বিদেশি কতিপয় গোষ্ঠীর লোভের বলি হয়ে ছিন্নভিন্ন হচ্ছে।

ফুলবাড়ী প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, কৃষিজমি নষ্ট করে, খাদ্যনিরাপত্তা নষ্ট করে উন্মুক্ত খনি করা হবে না। নতুন প্রযুক্তির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। খুবই সঠিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু তাঁর কথা আর সরকারের নানা মহলের কাজে কোনো সংগতি নেই। লবিস্টদের তৎপরতা চলছেই। লন্ডনে ফুলবাড়ীর কয়লাখনি দেখিয়ে জালিয়াতি শেয়ার ব্যবসা চালাচ্ছে বিদেশি কোম্পানি। নতুন প্রযুক্তির জন্য, নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিকাশের জন্য জাতীয় সক্ষমতার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। সেদিকে কোনো উদ্যোগ নেই।

শেখ হাসিনা বলেছেন, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশে পরিণত হবে। খুবই সম্ভব, এর আগেই সম্ভব। কিন্তু বিশ্বে এমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই, যেখানে নিজেদের খনিজ সম্পদের ওপর জাতীয় কর্তৃত্ব ছাড়া কোনো দেশ উন্নতি করতে পেরেছে। জ্বালানি সার্বভৌমত্ব জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও উন্নয়নের পূর্বশর্ত। নিজেদের সার্বভৌম ক্ষমতা বিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে দিয়ে কোনো দেশ কি উন্নতি করেছে? এ রকম কোনো দৃষ্টান্ত কি আছে, নিজেদের জমি-পানিসহ নবায়নযোগ্য ও গ্যাস-কয়লাসহ অনবায়নযোগ্য সম্পদের সর্বনাশ করে কোনো দেশ বিষচক্র থেকে বের হতে পেরেছে? না, নেই।

দায়মুক্তি আইন করে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে সরকার যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে দেশের কতিপয় গোষ্ঠী এবং যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন ও রাশিয়ার শাসকেরা খুশি, কিন্তু বিপদাপন্ন বাংলাদেশ। দেশ ও জনস্বার্থ বিবেচনার কেন্দ্রে থাকলে কী করে রামপালে সুন্দরবনধ্বংসী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার প্রকল্প হতে পারে? সরকারি পদের দায়িত্বে থাকা কতিপয় ব্যক্তি, সুন্দরবন এলাকায় ভূমি দখলে উদগ্রীব কতিপয় দস্যু ও হাতে গোনা কয়েক জন নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ ছাড়া কাউকে পাইনি, যাঁরা এই বিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে উদ্বিগ্ন নন। এটি যে সুন্দরবন ধ্বংস করবে, সে ব্যাপারে তাঁরা সবাই নিশ্চিত। কর্মকর্তারা 'বাঙালকে হাইকোর্ট দেখানো'র মতো সুপারক্রিটিক্যাল টেকনোলজির গল্প বলেন। আমি ভারতীয় কোম্পানি এনটিপিসির কেন্দ্র সিংগ্রলিতে তাদের কার্যক্রম দেখে এসেছি। দেখেছি, উন্মুক্ত খনি ও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে কীভাবে এককালের ঘন বনজঙ্গলের এলাকা এখন বিরান, বিষাক্ত, পানি-বাতাসদূষিত। অ্যাশপন্ড বা ছাইয়ের পুকুর অঞ্চলের সব জলাধার এমনকি পানি পানের শেষ ভরসা কুয়ার পানি বিষাক্ত করেছে। খাদ্য উৎপাদনের উপযোগী জমি নেই। ঘরে ঘরে অসুস্থ শিশু। প্রতি তিন বাড়ির এক বাড়িতে এখন পাগল পাওয়া যাচ্ছে।

অনেকেই প্রশ্ন করেন, তাহলে বিকল্প কী? সুন্দরবনের বিকল্প নেই, কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদনের অনেক বিকল্প আছে। প্রথমত, যেহেতু ভারতের কোম্পানি এটি পরিচালনা করবে, যেহেতু ভারতের ব্যাংক এর জন্য ঋণ জোগান দেবে, যেহেতু ভারতের বিশেষজ্ঞরা এখানে কাজ করবেন, যেহেতু সম্ভবত ভারতের কয়লাই এখানে ব্যবহার হবে; সেহেতু ফ্রেন্ডশিপ কোম্পানির এই কেন্দ্র ভারতেই প্রতিষ্ঠিত হোক, আমরা না হয় বিদ্যুৎ কিনব। অথবা দ্বিতীয়ত, সব বিধি মেনে স্বচ্ছতার সঙ্গে বাংলাদেশের অন্যত্র এই বিদ্যুৎকেন্দ্র হতে পারে। অথবা তৃতীয়ত, যে পরিমাণ বিদ্যুৎ এই কেন্দ্র থেকে পাওয়া যাবে, তার চেয়ে বেশি বিদ্যুৎ, ২০ ভাগের এক ভাগ অর্থে, বিদ্যমান বিদ্যুৎকেন্দ্র মেরামত ও নবায়ন করেই পাওয়া সম্ভব। অথবা চতুর্থত, নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বৃহৎ উদ্যোগ। ভারতের রাজস্থানই তার একটি ভালো দৃষ্টান্ত।

গ্যাসভিত্তিক বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের জন্য বিশাল উৎস হবে বঙ্গোপসাগর। এটি বাংলাদেশের জন্য এক বিশেষ সুবিধা, যা বহু দেশে নেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ভুল ও লোভী নীতি ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করছে। ১৭ ফেব্রুয়ারি বঙ্গোপসাগরে গ্যাস ব্লক নিয়ে আরেকটি সর্বনাশা চুক্তি করল সরকার। সংশোধিত 'পিএসসি ২০১২' অনুযায়ী সরকার ভারতের অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস করপোরেশন (ওএনজিসি বিদেশ) এবং অয়েল ইন্ডিয়ার সঙ্গে বঙ্গোপসাগরের এসএস ৪ ও এসএস ৯ নামে চিহ্নিত ১৪ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকার দুটি গ্যাস ব্লকের চুক্তি সম্পাদন করেছে।

এর আগে পিএসসি ২০০৮ ও তাতে রপ্তানির বিধান নিয়ে আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। জনপ্রতিরোধ ও জনমতের চাপে পিএসসি ২০১২ সালে রপ্তানির বিধান রাখা হয়নি। কিন্তু বর্তমান দলিলে অনেক চালাকি করা হয়েছে। মার্কিন ও ভারতীয় কোম্পানিগুলোর দাবির কাছে নতি স্বীকার

করে সরকার পিএসসি ২০১২ সংশোধন করেছে। তাদের কথামতো চুক্তির দলিল বা পিএসসি সাজানোর পর দরপত্র আহ্বান
করা হয় এবং আগে থেকে ঠিক করা কোম্পানিগুলো তাতে সাড়া দেয়। ভারতের ওএনজিসি এবং যুক্তরাষ্ট্রের কনোকোফিলিপস তাদের অন্যতম। কনোকোফিলিপসের সঙ্গে ৭ নম্বর গ্যাস ব্লক নিয়ে সরকার আরও একটি চুক্তি করার অপেক্ষায়।

কোম্পানিগুলোর উচ্চ মুনাফা ও কর্তৃত্ব নিশ্চিত করতে সংশোধিত পিএসসিতে যেসব বাড়তি সুবিধা নতুন করে দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে আছে প্রথমত, গ্যাসের ক্রয়মূল্য, অর্থাৎ বাংলাদেশ যে দামে গ্যাস কিনবে তার দাম আগের চুক্তির তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বাড়ানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত, প্রতিবছর গ্যাসের দাম শতকরা পাঁচ ভাগ হারে বৃদ্ধির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তৃতীয়ত, ব্যয় পরিশোধ পর্বে বিদেশি কোম্পানির অংশীদারি শতকরা ৫৫ ভাগ থেকে বৃদ্ধি করে শতকরা ৭০ ভাগ করা হয়েছে। চতুর্থত, ইচ্ছামতো দামে তৃতীয় পক্ষের কাছে গ্যাস বিক্রির অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

এই চুক্তির কারণে তাই নিজের গ্যাস সম্পদ কেনার ক্ষমতা বাংলাদেশের থাকবে না, কিনতে গেলে ভয়াবহ আর্থিক বোঝার সম্মুখীন হতে হবে। এ ছাড়া একাধিক ব্লকে গ্যাস পাওয়া গেলে জোগান এত বেশি হবে যে রপ্তানি তখন অনিবার্য হয়ে উঠবে, যা শুধু এই কোম্পানিগুলোকেই লাভবান করবে। সে জন্যই কি দলিলে গ্যাস রপ্তানির ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা রাখা হয়নি? চার বছর আগে সংসদে উত্থাপিত ‘খনিজ সম্পদ রপ্তানি নিষিদ্ধ আইন’ও পাস করা হয়নি, উল্টো রপ্তানিনীতিতে খনিজ সম্পদ রপ্তানির বিধান রাখা হয়েছে।

‘পুঁজির অভাব’-এর যুক্তি তুলেই স্থলভাগ ও সমুদ্রে একের পর এক গ্যাস ব্লক বিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে নাকি ‘বিপুল পরিমাণ’ অর্থের প্রয়োজন, আর তা বাংলাদেশের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। কত সেই পরিমাণ? সর্বশেষ চুক্তি অনুযায়ী ওএনজিসি আট বছরে বিনিয়োগ করবে প্রায় ১৪ কোটি ডলার বা এক হাজার ১০০ কোটি টাকা, মানে বছরে গড়ে ১৩৮ কোটি টাকা। তার মানে প্রতিবছর মন্ত্রী-আমলাদের গাড়ি কেনার বা বিলাসিতার খরচ একটু কমালেই সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধানের টাকার জোগান হয়। তা ছাড়া ওএনজিসি আট বছরে যে পরিমাণ বিনিয়োগ করবে, তার প্রায় দ্বিগুণ অর্থ গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে অলস পড়ে আছে। শত-হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি আর পাচারের হিসাব নাহয় না-ই দিলাম।

‘বাংলাদেশের সক্ষমতা নেই’—বারবার এই যুক্তি তোলা হয়। কবে এই সক্ষমতা আসবে, সে ব্যাপারে কি কোনো কথা আছে? জাতীয় সক্ষমতা বিকাশে সরকারের কি কোনো উদ্যোগ আছে? কোনো সরকারের ছিল? না। ভারতের সক্ষমতা অর্জনে কত বছর লেগেছিল? প্রতিষ্ঠার ১৩ বছর পরই ওএনজিসি সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ শুরু করেছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৪২ বছর পরও, ‘আমরা পারব না’, এটাই সরকারগুলোর সার্বক্ষণিক কথা। অক্ষমতার প্রচার করে, একটি সমৃদ্ধ দেশের সম্পদ বিনাশের নানা চুক্তি হতে থাকে।

দক্ষ কোম্পানি বলে যে ওএনজিসির সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ ভারতেই আছে। কনোকোফিলিপস তো দুর্ঘটনার রাজা হিসেবেই পরিচিত। অথচ পিএসসিতে দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণের ধারা দুর্বল করে রাখা হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে যদি দুর্ঘটনা হয়, ক্ষতি কত দূর বিস্তৃত হবে, তা চিন্তা করাও কঠিন। মাগুরছড়া-টেংরাটিলার অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত। কোনো সরকার এই ক্ষতির জন্য মার্কিন শেভরন ও কানাডিয়ান কোম্পানি নাইকোর কাছ থেকে আমাদের প্রাপ্য পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আদায়ের উদ্যোগ নেয়নি।

এতসবের পরও প্রশ্ন করা হবে, এর বিকল্প কী? আমাদের তো গ্যাস লাগবে! বিকল্প নিশ্চয়ই আছে,

কিন্তু তাতে কমিশনভোগীদের সুবিধা নেই। আমরা সরকারকে এ ধরনের আত্মঘাতী চুক্তি স্বাক্ষরের পরিবর্তে জাতীয় সংস্থার সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে, প্রয়োজনে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে সাব-কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে, জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রেখে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন কার্যক্রম গ্রহণের দাবি জানিয়েছি বারবার। শতভাগ জাতীয় মালিকানার অধীনে নির্দিষ্ট কাজে বিদেশি কোনো দক্ষ কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়া, বিদেশি বা প্রবাসী বিশেষজ্ঞদের এসব কাজে যুক্ত করায় তো কোনো অসুবিধা নেই। জাতীয় কমিটির সাত দফায় বিস্তারিত কর্মসূচির রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। কোনো সরকারের এতে আগ্রহ দেখা যায় না।

জনস্বার্থ যদি উন্নয়নচিন্তার কেন্দ্রে থাকে, তাহলে ধ্বংসের বিকল্প ঠিকই পাওয়া সম্ভব। কিন্তু তার জন্য ঘাড়টা ঘোরাতে হবে। না ঘোরালে জনগণকেই ব্যবস্থা নিতে হবে। বাংলাদেশ এই দেশের মানুষের, আর কারও নয়।

আনু মুহাম্মদ: অর্থনীতিবিদ ও অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
প্রথম আলো ১৯৯৮ - ২০১৫

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ফোনঃ ৮১৮০০৭৮-৮১, ফ্যাক্সঃ ৯১৩০৪৯৬, ই-মেইলঃ info@prothom-alo.info

এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা বা ছবি অনুমতি ছাড়া নকল করা বা অন্য কোথাও প্রকাশ করা সম্পূর্ণ বেআইনি